আয়শা খানম ঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সাম্প্রতিক চিত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ কোথায়? দেশের সরকারপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আমার অতি বিনীত জিজ্ঞাসা, বাংলাদেশের নারীরা আর কতোদিন পুলিশি বর্বর নির্যাতন মোকাবিলা করবে? বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পক্ষে আমার দাবি সরকারপ্রধান হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসনকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিন, নারীদের প্রতি পুলিশের সকল প্রকার নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য।

আমি আজ যে ধরনের নারী নির্যাতনের কথা বলছি তা কোনো প্রকার মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতন নয়, পরিবারে নারী নির্যাতনও নয়। আমি বলছি সাম্প্রতিক সময়ে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা। রাজপথে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী, নারী কর্মীদের দৈহিক নির্যাতনের কথা। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ, সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সংকট ও বাধা বিরাজমান। এই সত্য প্রতিটি সাধারণ নাগরিক তিলে তিলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন। এর জন্য বিশেষজ্ঞ বা গবেষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ঝানু রাজনৈতিক কর্মী হওয়ার দরকার নেই। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার, নানা প্রকার মৃত্যু যেমন হার্ট এটাকে মৃত্যু, ক্রসফায়ারে মৃত্যু, পক্ষ-বিপক্ষের গোলাগুলিতে মৃত্যু, বুলেটবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, গ্রেনেড হামলায় মৃত্যু, অপঘাতে মৃত্যু, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মৃত্যু, আর এসব মৃত্যুর মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভাবনার মৃত্যু, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মৃত্যু, এসব অনেক গভীরতর সবকটি

সংকট সমস্যা বিদ্যমান। এসব সত্ত্বেও বলবো বেশকিছু উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এতোসব সংকটের মাঝেও বাংলাদেশের সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক অঙ্গনে, অর্থনীতির মূলধারায় অনেক মৌলিক ইতিবাচক উপাদান দৃশ্যমান হচ্ছে, যা আমাদের শত সংকটের মাঝেও আশার আলো জাগায়। তাহলো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজপথে ব্যাপক নারীর সাহসী সক্রিয় অংশগ্রহণ। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে মিছিলে, রাজপথে, ছাত্রী যুব-নারী, বর্ষীয়ান নারী সংগঠক, নেত্রীদের বলিষ্ঠ সাহসী সক্রিয় অংশগ্রহণ অনেক নির্যাতনের মধ্যে আশার আলোরেখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।পাকিস্তানি দুঃশাসনের আমলে ছাত্র আন্দোলনে ব্যাপক ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের চিত্র, ষাটের সত্তরের দশকের ছাত্র আন্দোলনে নতুন গুণগত মাত্রা যোগ করেছিল। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে নব্বইয়ের দশকে আন্দোলন-সংগ্রামে বিশেষ করে ছাত্র-কর্মী ও নারী আন্দোলনে তরুণী থেকে শুরু করে বর্ষীয়ান প্রবীণ নারী নেত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় রাজপথে দৃশ্যমান হতে থাকেন। ১৯৭৫-এর 'কালরাতের' পর গোটা দুই দশকের নারী আন্দোলনে ব্যাপক সংখ্যক নারী সংগঠকদের রাজপথের বলিষ্ঠ উজ্জ্বল উপস্থিতি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহত করা, সামরিকতন্ত্রের অবসান করা, গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জোরদার করার আন্দোলনকে বিশেষ শক্তি দিয়েছে। প্রতিটি সংগ্রামে নারীসমাজ সাহসী, সক্রিয় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। সেই সময় জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বহুমুখী বিস্তৃত ধারায় গভীরভাবে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনও শক্তি লাভ করেছে, বিশেষ বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েছে, বিশেষ এক ধারায় বিকশিত হয়েছে। সেই সময় রাজপথে ও সামগ্রিক আন্দোলনে ব্যাপক নারীর উপস্থিতি জাতীয় গণতন্ত্রের আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। পাশাপাশি গণতন্ত্রের শক্তিশালী আন্দোলন নারী আন্দোলনকে বিশেষ গতি দিয়েছে, যা বাংলাদেশের নারী আন্দোলন ও নারী নেতৃত্বকে অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই গড়ে তুলেছে, আজকের নেতৃত্বে সমাসীন হওয়ার পথ তৈরি করে দিয়েছে। ঐতিহাসিক সংগ্রাম, ঐতিহাসিক নেতা নেতৃত্ব তৈরি করে। ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সত্য। নব্বইয়ের একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচারবিরোধী

আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্রীসমাজ সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। আর বাংলাদেশের নারী সমাজ আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় প্রাণপ্রিয় প্রয়াত সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে রাজপথ দখল করে রেখেছিল দীর্ঘ এক দশকের অধিক সময়। তিনি একাই বিশেষভাবে বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন তৎকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাহসের সীমানা। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, এককালের আপোসহীন নেত্রী মাননীয় বেগম খালেদা জিয়া ও সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, জননেত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের নেতৃত্ব দিয়েছেন অসীম সাহস ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে। রাজপথে, বিশাল গণমিছিলে, দেশব্যাপী পদযাত্রায় শেখ হাসিনা সারা দেশ কাঁপিয়েছিলেন। সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে খালেদা জিয়া তার সহকর্মীদের নিয়ে সারা দিন রাস্তায় বসে থেকেছেন। রাজপথে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাস তৈরি হয়েছে। মতিয়া চৌধুরী সে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন ষাটের দশকে। সেদিন খালেদা জিয়ার সঙ্গে ছিলেন আরো অনেক নারীনেত্রী। ফরিদা হাসান, আমাদের বৈজুভাবীর সঙ্গে অতি কাছে থেকে আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে সেই দৃশ্য দেখেছি। ইতিহাসে সেদিনের এসব ঘটনা ও দৃশ্যের সাক্ষী আমার মতো আরো অনেক নারীকর্মী। সেদিন অনেক কাছ থেকে এসব দৃশ্য দেখেছি আর মনে মনে আশা পোষণ করেছি, ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের রূপ যাই হোক, তিন জোটের রূপরেখার বাস্তবায়ন যাই হোক, নারীরা রাজপথে ভূমিকা রাখবে অনায়াসে, নির্বিবাদে, নিরাপদে। সম্মানহানি তো দূরের কথা বরং তাদের সাহস ও বলিষ্ঠতার চিত্র সারা দেশে গণতন্ত্রের রূপরেখাকে বলিষ্ঠতর করে তুলবে। সুদূর অতীতের গ্রিসের কেনা দাসী বা নিকট-অতীতের দক্ষিণ আফ্রিকার কেনা কালো মানবী দাসীর মতো পুলিশি নির্যাতনের শিকার হবেন না। এই আশায় আমি ও আমার মতো অনেক নারী কর্মীরাই আন্দোলিত হয়েছি। আজ আরো প্রশ্ন জাগে তাহলে আমাদের, অনেকের, সকলের সংগ্রামের ফসল আজকের বাংলাদেশের নবতর গণতন্ত্র কি ব্যাপক নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়িয়ে দিলো? না কি তা কেবল গোটা কয়েক নারীর জন্য? যারা মৌসুম বোঝে গীত গায়, আর ঢোল বাজায়?

সেদিন সচিবালয় ঘেরাও আন্দোলনে মাননীয় নেত্রীর সেই সময়ের নিত্যসঙ্গী

প্রবীণ নেত্রী ফরিদা হাসানকে এরশাদের পুলিশ বাধা দিয়েছে। এটা সত্য, তবে চুলের মুঠি ধরেনি। পেটে-পিঠে লাথি মারেনি নারী কর্মীদের। উনারা শিশু একাডেমীর দিকে চলে গেলেন। অতি নিকট-অতীতের এই ঘটনার উল্লেখ করছি এই কারণে যে, অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকারের কাছে গণতান্ত্রিক আচরণ পাওয়ার প্রত্যাশা কম থাকে। তবে নির্বাচিত সরকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারকারী সরকারের কাছে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকে। এরশাদের শাসন ভালো ছিল এ কথা বলতে চাই না। শুধুমাত্র ইতিহাস দেখি, ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই। দেশের আর দশজনের মতো আমিও একজন কর্মী হিসেবে নিজেদের কাজের খানিকটা হিসাব মেলাতে কখনো কখনো চেষ্টা করি। তখন দেখি অনেক হিসাব মেলে না। সেই সময় বাংলাদেশের নারী সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলন নামে ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে গণতন্ত্রের আন্দোলনকে বেগবান করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। শত শত মিছিল করেছি রাজপথে। শতসহস্র নারী কর্মীরা, বর্ষীয়ান নেত্রীরা যোগ দিয়েছেন সেই মিছিলে। এরশাদের পুলিশ এসব নারী কর্মীর পেটে-পিঠে লাথি দেয়নি বা চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করেনি, তবে কি আমি বলবো ঐ আমলেই ভালো ছিলাম? না আমি তা বলতে চাই না। কিন্তু মনে প্রশ্ন আসে তাহলে কেন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল? পরিস্থিতি ও ফলাফল যদি তারচেয়ে উন্নত না হয়?

অথচ আজ আমরা কি দেখছি? বিশেষ করে গত দুই বছর ধরে রাজনৈতিক দলের নারী কর্মীরা যখনই রাজপথে নামছেন, তাদেরকে কেবলমাত্র বাধা দেওয়া হচ্ছে না, বেধরক মার, লাঠিপেটা করা হচ্ছে, মানলাম তারা বিরোধী দলের কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে সুতরাং অপরাধ গুরুতর। বাধা দেওয়া হবে এবং হচ্ছে কিন্তু চুলের মুঠি ধরে টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে, গায়ের কাপড় খুলে ফেলা হচ্ছে, তাদেরকে প্রকাশ্য রাজপথে বিবস্ত্র করা হচ্ছে। থানায় নিয়ে আটক করে ইচ্ছামতো দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে। পুলিশ (মহিলা-পুরুষ) এসব নারী কর্মীর শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। তলপেটে পুলিশের বুট পায়ে লাথি দেওয়ার দৃশ্য খবরের কাগজে উঠেছে। জনৈক নারী কর্মীর তলপেটে এমনভাবে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে যে তার ফলে তার গর্ভপাত হয়েছে। নির্যাতনের শিকার এসব নারী

কর্মীর সঙ্গে আমার সারাসরি কথা হয়েছে। তাদের ওপর যে ধরনের দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে তার সকল বিষয়ে বিশদ বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার ভাষা ও রুচি কোনোটাই আমার নেই। একটি নির্বাচিত সরকারের পুলিশ বাহিনীর বর্বর, অকথ্য নারী নির্যাতনের কথা ও কাহিনী শুনতে শুনতে আমার ১৯৯৩ সালের বসনিয়া ও হারজেগোভিনিয়ার নারীদের কথা মনে পড়ছিল। ভিয়েনায় ১৯৯৩ সালে এসব নির্যাতিত নারীর একটি দলের সঙ্গে আমার সাক্ষাতে কথার বলার সুযোগ হয়েছিল। আমার আজ দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা, যন্ত্রণা এসব কোনো কিছু অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া জানানোর কোনো ইচ্ছা নেই। আমার শুধু আজ একটি বিনীত প্রশ্ন, তাহলো আমরা কেন গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করলাম? রাজনৈতিক ভিন্নমত, বিরোধীপক্ষতো বহুদলীয় গণতন্ত্রে থাকবেই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য দেশগুলোতেও আছে। ভারতে যে জঙ্গি নারী নেত্রীদের বিশাল বিশাল মিছিলে রাজপথ প্রকম্পিত হয় তাতেও পুলিশ মিছিলে বাধা দেয়, গাড়িতে তুলে নেয়। বেইজিঙে ১৯৯৫ সালে ভারতের দুর্ধর্ষ ও প্রতাপশালী দক্ষ পুলিশ অফিসার বিখ্যাত কিরণ বেদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তার বক্তৃতা শুনি, অসংখ্য শ্রোতা অসংখ্য প্রশ্ন করি, তিনি জানালেন তারা নারী কর্মীদের প্রতি পুরুষদের তুলনায় অনেকখানি ভিন্ন অর্থাৎ তুলনামূলক ভদ্র ও পরিশীলিত আচরণ করেন। বিরোধী কর্মীদের, রাজনৈতিকভাবে জঙ্গি কর্মীদের সরকারি প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বাধা দেন, গাড়িতে তোলেন, থানায় আটক করেন, জেলখানায় বন্দী করেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান বীর পুলিশ (ভাই!) ও নারী আন্দোলনের ফসল মহিলা পুলিশ (বোনদের?) মতো নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন না। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে পুলিশ প্রায় সর্বদাই তার মিছিলে বাধা দিচ্ছে, পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে জেলে দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের সৎ, সাহসী, অক্লান্ত পরিশ্রমী প্রিয় নেত্রী মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে যে অভদ্র, অশালীন আচরণ করা হয় তার মুখোমুখি মমতা ব্যানার্জিকে হতে হয় না।

২১ আগস্ট ২০০৪ সালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলার যে নারকীয় পরিণতি দেখলাম প্রিয় আইভি রহমান, বোন হাসিনা, রহিমাসহ ১৮/১৯ জন ভাইবোন চিরতরে নিথর-নীরব হয়ে গেলেন। পুরো ঘটনায় আমরা সকলেই

নিথর, নীরব, বোবা হয়ে গেলাম। শুধু নীরব হলেন না পুলিশ ভাই-বোনেরা, তারা আরো সক্রিয় হলেন। বিশেষ করে দীর্ঘ সময়ের রাজপথের সাহসী সাথী আইভি রহমানের চরম শোকাহত মৃত্যুর প্রতিবাদ ও শোক মিছিলে গভীর শোকার্ত নারী কর্মীদের ওপর যেভাবে আমাদের পুলিশ বাহিনী নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, তাতে দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। যুবলীগ নেত্রী নাজমাকে যেভাবে চুল ধরে টেনেহিঁচড়ে পিছনে লাথি দিয়ে গাড়িতে তোলা হলো সেই ঘটনা আর যাই হোক না কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পুলিশ প্রশাসনের কাজ হতে পারে না। নাজমাকে তার পিছনে, সামনে যেভাবে আঘাত করা হলো, আরো শত শত নারী কর্মীকে যেভাবে দৈহিক নির্যাতন করা হলো এ দেখে আমার ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিল যে, এই পুলিশ বাহিনীই তৎকালীন ইআরপি বা ইস্ট পাকিস্তান রিজিমেন্টের পুলিশ বাহিনী, যারা ১৯৭১ সালে বীরত্বের সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করে আমাদের সেদিনের মুক্তিযুদ্ধকে, আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে অগ্রসর করেছিল। আমাদের এই পুলিশ বাহিনী যেন অন্য কোনো আদর্শে দীক্ষিত নতুন এক বাহিনী। যারা নিছক কর্তব্য পালনেই কেবলমাত্র ক্ষান্ত নয়, ঘরের বাইরে যাওয়া নারীদের আচ্ছামতো শায়েস্তা করে সারা দেশে ভীতি ছড়িয়ে নারীদের ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে চিরকালের মতো; চিরকাল সম্ভব না হলেও কিছু সময়ের জন্য। নিছক কর্তব্যপালন আর বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা এই দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য পুলিশের আচরণে, তাদের ব্যবহারে, শিষ্টাচার বর্জিত কর্মকাণ্ডে আমরা কিছুটা বুঝতে পারি। আমার মনে হয় বিশ্বের অন্যান্য সভ্য দেশে মিছিলকারী নারী কর্মী ও পুরুষ কর্মীদের সঙ্গে কিছুটা ভিন্ন আচরণ করা হয়।

সভ্যতার সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুযায়ী নারীদের প্রতি যদি শ্লীল আচরণ করা হতো। এতে ক্ষমতাশীনদের দুর্বলতা নয়, শক্তির পরিচয় ঘটতো। তাদের সভ্যতার-ভব্যবতার পরিচয় ঘটতো। দেশের গণতন্ত্রেরও উপস্থিতিও পরিচয় প্রকাশ পেতো। অধিকন্তু এতে তো দেশের বহুল কথিত 'ভাবমূর্তির' উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটতো।

আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনিও উপলব্ধি করতে পারছেন যে, রাজপথে প্রকাশ্যভাবে নারীকে বিবস্ত্র করা হলে সমগ্র সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের সার্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সরকার, সংসদ, সংসদীয় নীতিমালা গণতন্ত্রের মান সব কিছুই উলঙ্গ হয়ে যায়, খসে পড়ে ন্যূনতম সভ্যতা-ভব্যতার দেশীয় সামাজিক শিষ্টতার মাপকাঠিটুকু! বাংলাদেশের গৃহে পরিবারে কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতিত হচ্ছেন, তাদের ওপর এসিড নিক্ষেপ হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, ধর্ষণের পর হত্যা হচ্ছে। মাত্র ২ দিন হলো রোকেয়া হলের গোসলখানায় ভিডিও ক্যামেরা রাখার চরম ঘৃণ্য কারসাজি, এসব নানা নির্যাতন, অপমানের কাহিনী চলছে। আমরা জানি এগুলো করছে কারা? অসচেতন অশিক্ষিত বর্বর পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির (যে সংস্কৃতি নারীকে ভোগ্যপণ্য মনে করে) ধারকবাহক কতিপয় পুরুষেরা। আর সেসব নির্যাতন দমন-প্রতিরোধ-অবসানের জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করছেন। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অনেক আইন হয়েছে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য, এসিড নিক্ষেপের জন্য, নারী পাচার বন্ধের জন্য, যৌতুক বন্ধের জন্য, ইত্যাদি অনেক নারী নির্যাতন-নির্বতন প্রতিরোধমূলক আইন হয়েছে। বর্তমান সরকারও নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ২০০০কে সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে ২০০৩ সালে। পুলিশ প্রশাসনকে নারী নির্যাতন দমনের কঠোর নির্দেশ দিয়েও পাশাপাশি রাস্তায় নারী নির্যাতন চালাচ্ছে। এই দৈহিকভাবে নারী নির্যাতনের নাম কী হবে এবং এর জন্য কি কোনো বিশেষ আইনের কথা ভাবা হবে? এখন আরো প্রশ্ন, সরকারি নির্দেশে একজন পুলিশ কর্মকর্তা সকাল ১১টায় রাজপথে মিছিলকারী নারীর তলপেটে লাথি দিয়ে বিকাল ৪টায় বের হয়ে পড়বেন, কোনো নারী নির্যাতনকারীকে ধরে আনার জন্য? বা তার বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী তদন্ত রিপোর্ট তৈরির জন্য। যা নারী নির্যাতনবিরোধী মামলার জন্য খুব দরকার। যেভাবেই বলা হোক না কেন গত এক-দেড় বছরে নারী কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলা ছাড়া কোনো ব্যাখ্যাই হতে পারে না। সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নারী নির্যাতন জাতিসংঘের ভাষায় জাতিসংঘের নীতি বিরুদ্ধ কাজ, যা করা হচ্ছে বাংলাদেশে। এখনই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে, ২০০৫ সালের মার্চ মাসেই তাদেরকে বাংলাদেশের নারীর অধিকার

মর্যাদা বিষয়ক একটা ঝঃধঃঁং জবঢ়ড়ৎঃ প্রদান করতে হবে জাতিসংঘে নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনে।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, এ বছরই গত ৯ জুলাই জাতিসংঘ সিডও কমিটির সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিধিদের প্রশ্ন করেছিলেন যে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের মাত্রা এতো বাড়ছে কেন? নারী নির্যাতন দমনে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা কেমন? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর ছিল বাংলাদেশের নারীরা এখন আগের চেয়ে থানায় বা সংবাদপত্রে বেশি রিপোর্ট করে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি নিশ্চয়ই আর বাংলাদেশ সরকার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানার দরকার হবে না। গত দুই বছর, দরকার নেই, গত কয়েক মাসের সংবাদপত্রের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন এবং ইতিমধ্যে পেয়েও গেছেন। এতে বোধ হয় দেশের বাইরে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের 'ভাবমূর্তির' সমস্যা হবে। এর দায়িত্ব তো পুলিশই প্রশাসনকে নিতেই হবে। সৎ কর্মনিষ্ঠ সাংবাদিকদের দোষ তেমন দেয়া যাবে না। এখন আবার আজই (১২/৯/০৪ তারিখ) ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ-এ প্রথম পাতায় দেখলাম আরেক সুন্দর দৃশ্য। এবার পুলিশ নয়, আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের লালিত-পালিত ও বিশেষ করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমাদের দেশের কোনো না কোনো মা বোনের জঠরে জন্ম নেওয়া সোনার সন্তানেরা নিজেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে হাতে লাঠি নিয়ে নির্যাতনে উদ্যত। আশা এই যে পাশাপাশি একদল যুবককে রক্ষাকারীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ কোথায়? দেশের সরকারপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার কাছে আমার অতি বিনীত জিজ্ঞাসা, বাংলাদেশের নারীরা আর কতোদিন পুলিশি বর্বর নির্যাতন মোকাবিলা করবে? বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পক্ষে আমার দাবি সরকারপ্রধান হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুলিশ প্রশাসনকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিন, নারীদের প্রতি পুলিশের সকল প্রকার নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণ অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য। আয়শা খানম ঃ নারীনেত্রী। সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।